বিদায় হজের খুতবা : কিছু আলোকপাত

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আব্দুল কাদের

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ خطبة حجة الوداع: فوائد وعبر ﴾

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: الدكتور محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

বিদায় হজের খুতবা : কিছু আলোকপাত

হজের যাবতীয় বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে। হজের বিধানাবলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা, তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন করা, তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর আদেশ পালন করা, একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া এবং তাঁর যে কোনো অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করা। হজের শ্লোগানতুল্য তালবিয়ায় যেমন বলা হয়,

« لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ».

'আমি হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নেই।' [বুখারী : ৫৯১৫, মুসলিম : ১১৮৪] এভাবেই এ বাক্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তাওহীদের ঘোষণা। জমাট বাধা শিরকের অন্ধকার দূর করার জন্য এ বিশাল আহ্বান হাজীদের সঙ্গে ধ্বনিত থেকে থাকে। যাতে মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতি হয় সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন। পূর্বে যেমন তা ছিল পৌত্তলিকতা থেকে পবিত্র। তাওহীদের দীপ্তিতে তা দীপ্তিময় হয়। অহীর আলোয় তা হয় আলোকিত

এবং পরাক্রমশালী এক সত্তার দাসত্বে তা হয় অটল। তেমনিভাবে তা সব ধরনের তাগুত এবং মূর্তিকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ঈমানী কল্পনাকে সুদৃঢ় করে। অতএব এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন কোনো মা'বুদ নেই ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সৃষ্টিজীব যার অভিমুখী থেকে পারে। এক আল্লাহ তা'আলার দিক ছাড়া এমন কোনো দিক নেই যেখান থেকে তারা তাদের আচরণ, আখলাক, তাদের শরীয়তের নীতিমালা কিংবা বিধানাবলী পেতে পারে। এক আল্লাহ তা'আলার পন্থা ছাড়া তাদের এমন কোনো পন্থা নেই যা তাদের জীবন এবং তাদের কার্যাদি পরিচালনা করতে পারে। আল কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۚ ﴾ [المائدة: ٧٣]

'এক ইলাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।'{সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৭৩}

বিদায়ী হজের বছর জিলহজ মাসের ৮ তারিখ। মক্কা মুকাররমার কোল থেকে মিনার পাথুরে অঞ্চলের উদ্দেশ্যে এক ঝাঁক নববী মশাল যাত্রা শুরু করল। সেখানেই রাত্রিযাপন করল। যাতে ৯ তারিখ আরাফার দিকে রওনা করা যায়। সেখানে সূর্য হেলে যাওয়ার পর নানা জনপদ থেকে দলে দলে দুর্গম গিরি ডিঙ্গিয়ে আসা লাখো জনতার উদ্দেশে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেন। এমন সারগর্ভ ও ব্যাপক খুতবা দান করেন, যা প্রতিটি হৃদয় ও কর্ণকে প্রজ্ঞা ও বিধানে, অনুগ্রহ ও বিশ্বাসে এবং দয়া ও সদাচারে পূর্ণ করে দিয়েছে। এ থেকে প্রতিটি অন্তর খুঁজে পেয়েছে আত্মশুদ্ধির যাবতীয় উপায়, হেদায়েতের সকল প্রকার এবং জাতিঘাতি সব ব্যাধি থেকে সুরক্ষার পন্থা।

বলাবাহুল্য, এ ছিল এমন এক উপলক্ষ এত বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে এভাবে কথা বলার সুযোগ নিয়ে যা বারবার আসে না। বিদায়ী নেতার সঙ্গে কোনো জাতির এমন প্রাণোচ্ছল ও বিশ্বাসদীপ্ত সাক্ষাতের তুলনা হয় না। একইসঙ্গে তা বাঁধ ভাঙ্গা কান্না ও বিষাদেরও উপলক্ষ। কারণ, তা ছিল আখেরী উম্মতের কাছ থেকে আখেরী নবীর শেষ সাক্ষাৎ।

«أَيّهَا النّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي ، فَإِنّي لَا أَدْرِي لَعَلّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا».

‘হে লোক সকল, তোমরা আমার কথা শুন, কারণ আমি জানি না সম্ভবত এ বছরের পরে এ জায়গায় আর কখনো তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না।’ [ইবন হিশাম, আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ : ২/৬০৩] উম্মতের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর এ ভাষণে স্থান পেয়েছে স্থায়ী রিসালাতকে পৃথককারী বিশাল প্রমাণস্বরূপ সাধারণ নীতিমালা এবং

ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের ভিত্তিসমূহ। কোনো মাইক বা প্রচার মাধ্যম ছাড়াই এ বিশাল গণজমায়েত তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেছে।

এ খুতবায় ছিল আকীদাগত, পদ্ধতিগত ও আচরণগত অনেক বিষয়, যেগুলো মৌলিক নিদর্শনের পর্যায়ে। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে ইসলামের নীতিমালা। ধ্বংস হয়েছে শিরকের প্রাসাদ। আর সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে সেসব হারাম বিষয় যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য রাসূলের ধর্মগুলো একমত। যেমন এ বক্তব্যে ছিল :

১. জান-মালের নিরাপত্তা :

« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ».

'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের আজকের এ মাস, তোমাদের আজকের এ শহরের মতই তোমাদের জন্য হারাম।' [মুসলিম : ৩০০৯]

মানুষের জীবন ও মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এই অবিস্মরণীয় বক্তব্যে উচ্চারিত প্রথম ঘোষণাই ছিল রক্তপাত হারাম ও জীবন নাশ থেকে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ﴾ [الانعام: ١٥١]

‘আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৫১}

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿ مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ ﴾ [المائدة: ٣٢]

‘এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।’ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩২}

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

‘তিন কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল নয়। বিবাহিত ব্যভিচারী, হত্যার বদলা হত্যা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে আলাদা দীন গ্রহণকারী।’ [বুখারী : ৬৮৭৮; মুসলিম : ১৬৭৬]

উপরন্তু ইসলাম যেসব অমুসলিমের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছে, তাদের হত্যা করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

‘যে ব্যক্তি চুক্তিকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করল সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে চল্লিশ বছরের দূরত্ব সমান জায়গা থেকে।’ [বুখারী : ৩১৬৬]

সুতরাং শরীয়তের সীমারেখার বাইরে মানুষ হত্যা করা মহা অন্যায় এবং কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ ﴾ [الاسراء: ٣٣]

‘আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৩৩}

মানুষের জীবন তো কেবল আল্লাহ তা‘আলাই কেড়ে নিতে পারেন যিনি জীবন দান করেন। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ এবং শরয়ী হুদুদ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রাণ সংহার করার অনুমতি অন্য কারো নেই।

তেমনি এ খুতবা জনস্বার্থে ব্যবহৃত সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে এবং সম্পদ খরচ ও তা কাজে লাগাতে জানে না এমন অর্বাচীনের হাতে এ সম্পদ অর্পন নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং তসরুফ করার জন্য এ সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না এবং এ সম্পদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যদিও তাদের ভরণ-পোষণ এবং সদাচারণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥ ﴾ [النساء : ٥]

‘আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা

থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ০৫}

বিনষ্টকারীর বিনষ্ট করা থেকে এবং প্রতারক ও খেয়ানতের হাত থেকে এ সম্পদ রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী মজবুত বেষ্টনী নির্ধারণ করেছেন, যা এদের থেকে এ সম্পদকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨ ﴾ [المائدة: ٣٨]

'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩৮}

আয়াতটির মাধ্যমে খুতবাকে এ মর্মে তাগিদ করা হয়েছে যে, দীনের হেফাযত করা অপরিহার্য যা একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও জিহাদের চেতনা সংরক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। তেমনি জীবনের হেফাযত করাও অপরিহার্য যা রক্তপাত ও হত্যা থেকে সংরক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। ঠিক সেভাবে সম্পদ রক্ষা করাও জরুরী যা সঠিক

পরিচালনা, পথ প্রদর্শন এবং মন্দ লোকের হাত থেকে রক্ষা করা ছাড়া সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে :

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ﴾ [المائدة: ٣٣]

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে।' {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩৩}

এই পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতার মাধ্যমে পবিত্র শরীয়ত এমন শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করেছে, যা মানুষের সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়। যে জীবনকে ঘিরে আছে মর্যাদা এবং যার ওপর উড়তে থাকে নিরাপত্তা ও স্বস্থির পতাকা। এর ভিত্তি এমন কিছু বিষয়ের ওপর যেগুলোকে বাদ দিলে মানবাধিকারের সকল শ্লোগানই অসাড় হয়ে যায় এবং যার সামনে ম্লান হয়ে যায় পৃথিবীর সকল মানবাধিকার সংগঠন ও নিরাপত্তা আইন।

২. জাহিলিয়াতের সব কিছু বাতিল ঘোষণা :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খুতবায় আরও বলেন,

« أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ».

'জেনে রেখো জাহিলিয়াতের সকল বিষয় আমার পদতলে স্থাপিত। জাহিলিয়াতের সকল হত্যা মামলা রহিত। সর্বপ্রথম আমাদের যে হত্যার বদলা রহিত করছি তা হলো ইবন রবিআ বিন হারেছের হত্যার প্রতিশোধ। সে বনু সা'দ গোত্রে স্তন্যদানকারীর সন্ধানে গিয়েছিল। যেখানে হুযাইল তাকে হত্যা করেছিল। আর জাহেলী যুগের প্রথম যে সুদ রহিত করছি তাহলো আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালেবের সুদ। কারণ তার সবটাই রহিত।' [মুসলিম : ১২১৮]

অনন্তকালের জন্য জাহেলী যুগের বিষয়গুলোকে পেছনে ছুড়ে ফেলা দেয়ার এ ব্যাপারে এখানে বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। জাহিলিয়াতের যাবতীয় বিষয় ছিল শিরক, প্রবৃত্তি পূজা, ব্যাপক অরাজকতা এবং সুস্পষ্ট

জুলুম নির্ভর। তাই তাতে ফিরে যাবার অবকাশ নেই। কারণ, ইসলাম বলতে বুঝায় আল্লাহ তা‘আলা যে সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন তা অপরিহার্য করে নেয়া। ইলাহ হিসেবে তাকে একমাত্র মনে করা এবং সত্যায়নের মধ্য দিয়ে মাখলুকের একমাত্র রব হিসেবে আল্লাহর জন্য নিজেকে নত করা। এছাড়া গোটা জীবন বিস্তৃত ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করে নেয়া। পক্ষান্তরে জাহিলিয়াহ বলতে বুঝায় চিন্তা ও বিশ্বাসে ভ্রান্তি, জীবনের মর্ম উপলব্ধিতে ভ্রান্তি, লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ভ্রান্তি, অভ্যাস ও আচরণে ভ্রান্তি, ব্যবস্থাপনা ও চরিত্রিক ভ্রান্তির সমষ্টিকে। ইসলামের আগমনে এর সবই বিদূরিত হয়েছে। ইসলাম আগমন করেছে মানুষের ইচ্ছা, অভ্যাস, কল্পনা, বাস্তবতা, পদ্ধতি ও আকীদাকে পরিবর্তন করতে। সম্মানজনক ভিত্তির ওপর মানুষের জীবনকে অধিষ্ঠিত করতে। যাতে নেই পদস্খলন, অস্থিরতা কিংবা সদা বিরাজমান অশান্তি। হ্যা, ইসলাম এসেছে আদর্শিক, চৈন্তিক ও রাজনৈতিক তথা জাহিলিয়াতের সকল রূপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। যেমন :

জাহিলিয়াতের চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান :

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَطَآئِفَةٞ قَدۡ أَهَمَّتۡهُمۡ أَنفُسُهُمۡ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِۗ ﴾ [ال عمران: ١٥٤]

'আর অপরদল নিজরাই নিজদেরকে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল, 'আমাদের কি কোন বিষয়ে অধিকার আছে'? বল, 'নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৪}

ইসলামী আকীদা তার অনুসারীদের এভাবে গড়ে তোলে যে তাদের মনে নিজের বলতে কিছু থাকে না। সে নিজে হয়ে যায় একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁর জন্যই সে জিহাদ করে। তাঁর পথেই সে বিচরণ করে। তাঁর রাস্তায় সে মানুষকে ডাকে| তাঁর আদেশেই সাড়া দেয়। তার ফয়সালা ও সিদ্ধান্তই সে মেনে নেয়। সর্বোপরি সে সন্তুষ্ট থাকে তাঁর যাবতীয় নির্দেশ ও বিধানে।

জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান প্রত্যাখান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾ [المائدة: ٥٠]

‘তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?’ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৫০}

আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লামা সা‘দী রহ. বলেন, ‘তাদের বক্তব্য এবং আপনার কাছ থেকে বিমুখ হওয়ার মধ্য দিয়ে তারা কি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের কাছে প্রেরিত বিধানের বিপরীত জাহেলী বিধান চায়? হয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান গ্রহণ করতে হবে নয়তো জাহেলী বিধান। এতদুভয়ের মধ্যে তৃতীয় কোনো বিধান নেই। অতএব যে প্রথমটি (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে (দ্বিতীয়টি) জাহেলী বিধানের অনুগামী বলে গণ্য হবে। জাহেলী বিধানের মূলে রয়েছে মূর্খতা, অনাচার ও পথভ্রষ্টতা। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা একে জাহেলী যুগের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা‘আলার বিধানের মূলে রয়েছে ইলম, ইনসাফ এবং নূর ও হেদায়েত।’[1]

জাহিলিয়াতের সৌন্দর্য প্রদর্শন প্রত্যাখ্যান :

---

[1]. তাফসীর সা‘দী, পৃষ্ঠা : ২২৪।

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ ﴾ [الاحزاب : ٣٣]

‘আর তোমরা গৃহে আবস্থান করো এবং প্রাক- জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৩}

মুজাহিদ রহ. বলেন, ‘জাহেলী যুগে নারীরা পুরুষদের সামনে নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করত। একেই জাহিলিয়াতের সৌন্দর্য প্রদর্শন বলা হয়েছে।’[2]

কাতাদা রহ. বলেন, ‘সৌন্দর্য প্রদর্শন হলো, নারীদের দেহভঙ্গি ও নৃত্যচালসহ ঘর থেকে বের হওয়া।’[3]

কেননা সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও বেলেল্লাপনার মাধ্যমে নারীদের ধার্মিকতা ও ধর্মীয় চেতনা ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে নারীরা বিশ্বাসঘাতক পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত ভোগ সামগ্রীতে পরিণত হয়। অশ্লীলতার ব্যাপকতা ঘটে ঈমানদারদের মাঝে। তারা প্রলুব্ধ হয় জাহেলী ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতির প্রতি।

---

[2]. আদ্দুররুল মানুছুর : ৬/২০৬।

[3]. তাবারী : ২০/২৫৯।

জাহিলিয়াতের গর্ব প্রত্যাখ্যান :

﴿ إِذۡ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ ٱلتَّقۡوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٢٦ ﴾ [الفتح: ٢٦]

'যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-আহমিকা পোষণ করেছিল, জাহিলী যুগের আহমিকা।' {সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত : ২৬}

ইসলাম এসেছে অন্ধ বংশপ্রীতির বন্ধনকে আকীদাগত ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মানা ও তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনার দিক থেকে এক আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের বন্ধনে রূপান্তরের জন্য। এমন বন্ধন যার ভিত্তি কোনো রক্ত, বর্ণ বা জাতীয়তার ওপর নয়। এ হলো ঈমানের আত্মীয়তা এবং আকীদার বন্ধন। কারণ, ইসলাম চায় মানব হৃদয় কেবল এক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হোক। আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার সম্পর্ক থেকে সে পবিত্র হোক। তার আত্মা হোক বর্ণবাদ, ভৌগলিক সীমারেখা ও জাতীয়বাদমুক্ত| এককথায় ইসলাম পরিপন্থী সব শ্লোগান ও সঙ্কীর্ণতা থেকে পবিত্র।

ঐতিহাসিক এ খুতবায় এমন কিছু ব্যাপক অর্থবোধক নমুনা ব্যক্ত হয়েছে যা অপরিহার্যভাবে জাহিলিয়াতের বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন গর্হিত বাহাদুরি ও ঘৃণ্য সুদের প্রচলন। জাহেলী যুগে মানুষের জীবনের মূল্য ছিল অতি নগন্য। খুনোখুনি ছিল গর্বের বিষয়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছিল বীরত্বের পরিচায়ক। রক্ত ঝরানো ছিল মর্যাদার চাবিকাঠি। সেখানে জীবনের কোনো লক্ষ্য ছিল না। ছিল না কোনো নির্দিষ্ট চেতনা। অরাজকতা এবং লালসার কোনো সীমা ছিল না। যে কোনো মূল্যে এবং যে কোনো পন্থায় সম্পদের অধিকারী হওয়াই ছিল সাফল্য ও নেতৃত্ব লাভের উপায়। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এ ভিত্তিগুলোকে বদলে দিতে। এসবকে এমন কিছু মৌলিক বিধানের মাধ্যমে পরিবর্তিত করতে যেখানে মানবতা পাবে তার সম্মান ও নিরাপত্তা। তাই সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে জাহিলিয়াতের গোঁড়ামী। তুলে ফেলা হয়েছে নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা। মানুষের প্রয়োজন নিয়ে সওদা করতে বাধা প্রদান করা হয়েছে। বিভেদ ও ভৌগলিক আধিপত্যকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। ব্যাবধান ও উঁচু-নিচুর সকল ভেদ রেখা তুলে দিয়ে তা কেন্দ্রিভুত করা হয়েছে কেবল একটি গুণের ওপর। আর তা হলো তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]

'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।' {সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১৩}

জাহিলিয়াতের বিষয়গুলো রহিত করার এই অভিযানকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের থেকেই সূচনা করেছেন :

« وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ».

'সর্বপ্রথম আমাদের যে হত্যার বদলা রহিত করছি তা হলো ইবন রবিআ বিন হারেছের হত্যার প্রতিশোধ।[4] আর জাহেলী যুগের সর্বপ্রথম যে সুদ

[4]. হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব।

রহিত করছি তা হলো আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালেবের সুদ। কারণ এর সবটাই রহিত।' [মুসলিম : ১২১৮]

যাতে বক্রহৃদয় ও প্রবৃত্তির অনুসারীরা বুঝতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মে কোনো পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা কিংবা মোসাহেবির স্থান নেই। আত্মীয়ের জন্য কোনো ব্যতিক্রম নেই। পরিবারের জন্য কোনো বিশেষত্ব নেই। লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির কোনো সুযোগ নেই। বিচার উদ্বোধন হবে নিজেকে দিয়ে। তারপর আসবে অন্যরা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই ছিলেন আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু এবং মহত্বের শিখর। তাই জাহিলিয়াতের রেওয়াজ ছুড়ে ফেলে সর্বপ্রথম আপন চাচাত ভাইয়ের হত্যার বদলা মাফ করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে তার চাচার প্রাপ্য সমুদয় ঋণ বাতিল করে সূচনা করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর বাণীগুলোকে সর্বজন প্রিয় বানিয়েছেন। এটিই আল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি যাকে কুরআন চিত্রিত করেছে :

﴿ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ ﴾ [هود: ٨٨]

‘যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না।’ {সূরা হূদ, আয়াত : ৮৮} এবং একে বাস্তবে রূপ দিয়েছে মহান সুন্নাতে নববী :

« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».

‘হে লোক সকল, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে এভাবে যে তাদের মধ্যে কোনো উচ্চ বংশীয় লোক চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার ওপর হদ প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম।’ [বুখারী : ৬৭৮৭ ; মুসলিম : ১৬৮৮]

ইসলাম কথা ও কাজের অমিল সম্পর্কে সতর্ক করেছে। বলবেন এক রকম আর করবেন অন্যরকম ইসলামে এ বড় নিন্দনীয়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [البقرة: ٤٤]

‘তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না?’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৪}

উপরন্তু আল্লাহ তা‘আলা ওই সব লোকের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণকে বৈধ করে দিয়েছেন, যারা সেই নিন্দনীয় পদ্ধতি এবং ঘৃণ্য আচরণ অবলম্বন করে থাকে।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٣ ﴾ [الصف: ٢، ٣]

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়।’ {সূরা আস-সাফ, আয়াত : ০২-০৩}

দীনদার শ্রেণীর জন্য সবচে বিপজ্জনক বিষয় হলো, সৎ কাজের আদেশ করা অথচ নিজে না করা। ভালো কাজের প্রতি আহ্বান করা অথচ নিজে তা ভুলে থাকা। পার্থিব উদ্দেশ্যে ও প্রবৃত্তির স্বার্থে কুরআনের শব্দগুলোকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা এবং অকাট্য প্রমাণসমূহের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা তালাশ করা। এতে শুধু দাঈ ও

ধার্মিকরাই সন্দেহপূর্ণ হয়ে যান না; তাদের দীনদারী ও দাওয়াতও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এতে করে দীনের ওপর মানুষের আস্থায় চিড় ধরে যেমন আস্থাহীন হয়ে পড়েন ওই দীনদার ব্যক্তি। কারণ, শব্দ যদি বিশ্বাসের আধার তথা অন্তর থেকে উৎসারিত হয় না হয়, তবে তা উচ্চারিত হয় শুষ্ক ও প্রাণহীন অবস্থায়। যার কোনো আবেদন থাকে না। মানুষ কোনো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে না যাবৎ তার কথা কাজে অনূদিত হয়। তার বাক্য উচ্চারণ কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : (রাসূলকে দেখতে চাও, তবে কুরআন দেখ। কারণ,) 'কুরআনই তার চরিত্র।' [মুসলিম : ৭৪৬]

কথা ও কাজ এবং আকীদা ও আচরণের মধ্যে মিল সৃষ্টির জন্য দরকার আত্মশুদ্ধির অনুশীলন। আর তা হয় আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়া এবং তাঁর সাহায্য ও তাওফীক প্রার্থনার মাধ্যমে। জীবনের ময়দান এবং বাস্তবতার টানাপোড়েন প্রায়শই মানুষকে স্বভাবজাত দুর্বলতা ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া মন্দের উপাদানের কারণে অন্যের আহ্বান করা পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। তবে সর্বদা কুরআনকে আঁকড়ে ধরা এবং সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার মাঝে রয়েছে সুরক্ষিত প্রাচীর। এটি

তার বাহককে জটিলতার গহ্বর এবং অপদস্ততার খাদ থেকে রক্ষা করে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الاسراء: ٩]

'নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।' {সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ০৯}

বিদায়ী খুতবাটি ছিল সর্বশেষ বিবৃতি, যাতে সার্বিক নীতিমালাকে দৃঢ় করা হয়েছে এবং মৌলিক পদ্ধতি এঁকে দেয়া হয়েছে। এটি ছিল মহানবীর আসমানী বন্ধুর উদ্দেশে চিরবিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে উম্মতের কাছে তাঁর রিসালাতের লক্ষ্য বর্ণনার সর্বশেষ সুযোগ। উদ্দেশ্য, উম্মতকে আশ্বস্ত করা, তাদের সৌভাগ্যের উপায় তুলে ধরা এবং আল্লাহর দীন ও তাঁর নেয়ামতের পূর্ণতার ঘোষণা দেয়া। তাই এ খুতবার পরপরই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন :

﴿ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ﴾ [المائدة: ٣]

‘যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।’ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ০৩}

প্রতি বছর হজের সময় এলেই বিভিন্ন মিডিয়ায় বিদায় হজের খুতবা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। বিজ্ঞ আলিম ও বিদ্বানগণ এ থেকে আমাদের জীবন পথের পাথেয় বলে দেন। আমাদের কাজ শুধু রাসূলুল্লাহর এ অন্তিম উপদেশগুলো কর্মে প্রতিফলিত করা। এর মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সাজিয়ে তা উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত করা। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে আপনার রাসূলের এ উপদেশ ও জীবন নির্দেশিকাগুলোকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণের তাওফীক দিন। আমীন।